সুস্থ চিন্তা ও কর্মই উন্নতির একমাত্র পথ

ব্যক্তি ও সমাজজীবনের কিছু অসামঞ্জস্যতা ও অব্যবস্থাপনা এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে কিছু কথা পত্রিকায় লিখে পাঠকসমাজকে অবহিত করি। এতে মনের ভিতরে জমে থাকা অস্থির-গুমোট ভাবটা অনেকটাই কেটে গিয়ে স্বস্তির ভাব ফিরে আসে। আমি উপকৃত হই। আমি এদেশের শাশ্বত 'মাস্টারসাহেবের' ভূমিকায় কাজ করে শান্তি বোধ করি। এদেশের মাস্টারসাহেবদের একজন হিসেবে এটা আমার দায়িত্বজ্ঞান বলেও মনে করি। একজন মাস্টারের দায়িত্ব শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই নয়, সমাজের প্রতিও আছে। জীবন ও জগতের যেখানেই 'শিক্ষা' ও 'শিক্ষণীয়' বিষয় আছে, শিক্ষকদের কাজ সেখানেই আছে। শিক্ষা, মানবকল্যাণ ও মানবিক গুণাবলি থেকে আমরা যত দূরে সরে যাব, আমাদের সার্বিক দুর্গতি ততই ঘনিভূত হবে। এদেশের অব্যবস্থা, দুর্নীতি, দুর্বলের প্রতি সবলের প্রাবল্য নিয়েও কখনো কখনো কথা বলি। সেটাও আমার পেশাগত দায়িত্ব। কোনো প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণও আমার অন্যতম পেশা। যদিও অনেক সময় সোজা-সাপটা কথা লেখার কারণে অনেকের বিরাগভাজন হতে হয়। অনেকেই নাখোশ হন। আমাকে কোনো না কোনো দলের রঙ মাখিয়ে দিতে চান। তখনই অসুবিধায় পড়ি। কোনো অব্যবস্থা নিয়ে কিছু কথা লিখলেই, বিশেষ করে সেই অব্যবস্থা থেকে সুবিধাভোগীরা আমার দিকে টেরা চোখে তাকান। অন্যায় ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বললেই কোনো মানুষ দলবাজ হয়ে যায় না। একটা রাজনৈতিক দলে থেকেও অনেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেন। আমি জানি, একসাথে সবাইকে মন রক্ষা করা যায় না। কারো মন রক্ষার জন্য বা মনে আঘাত দেওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু লিখিনে। যা লিখি তা নিতান্তই দায়িত্ববোধ থেকে উৎসারিত, দেশ ও সমাজের 'শিক্ষকসুলভ পথপ্রদর্শন' হিসেবে উজ্জীবিত ও উচ্ছলিত। এটা আমার ঐচিত্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। এদেশে শুধু দলীয় লোক বাস করবে, তা-ই নয়; কিছু দলাদলিহীন লোকের বসবাসও প্রয়োজন আছে। এটাই যে আমার পেশা, তা বোঝানো কঠিন হয়ে পড়ে। লিখতে বসে কখনো-সখনো কলম সামনে চলতে চায় না, নানাবিধ কথা মাথায় আসে, তাই লেখার মধ্যে নানাবিধ কারণে কখনো কিছু গৌরচন্দ্রিকা ('গীতিকাহিনী আরম্ভের পূর্বে শ্রীচৈতন্য বন্দনা বা শ্রীচৈতন্যের বর্ণনা; ভূমিকা, পূর্বাভাস') দিই।

আমি একজন শিক্ষক। সেজন্য সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শিক্ষাদান বিষয়ে কথা, শিক্ষার উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, সামাজিক সুশিক্ষা ও এর উপাদান, উপকরণ, পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে ভালো হয়। এসব নিয়ে আলোচনা ও পরিবেশ সৃষ্টি নিয়ে কথা বলতে গেলে দেশ ও রাষ্ট্র-সম্পর্কীত অনেক কথা চলে আসে। এর অর্থ এই নয় যে, আমাকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে হবে, আমি রাজনীতি-অন্ধ হব; নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে অতি উৎসাহী হয়ে রাজনীতির মই বেয়ে নিজ জীবনের উন্নতি খুঁজবো। এই যে রাজনীতির মই বেয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি– এটাও এদেশে ব্যবসা পেশার একটা অধুনাতন সংস্করণ। আমরা ক্রমশই সেদিকে সবেগে ধাবিত হচ্ছি। 'দেশসেবা', 'সমাজসেবা' শব্দযুগল রাজনীতির মাঠ থেকে হাত গুটিয়ে অভিধানে ঠাঁই করে নিয়েছে। কোনো কথা লিখতে বা বলতে স্ব-স্ব 'রাজ-বন্দনা' গাওয়ার সামাজিক রীতি ও প্রবণতা আমরা সমাজে দেখতে পাচ্ছি। আমরা কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো অনিচ্ছায় 'রাজা'র করকমলে এ বন্দনা উপহার দিচ্ছি। এতে ব্যক্তি স্বাধীনতার দশা নিয়ে আমরা কেউ-ই কিছু ভেবে দেখছিনে। ব্যক্তিস্বার্থই প্রথম বিবেচিত হচ্ছে। এগুলো পুরাকালের রাজা-বাদশাদের সময়ে রাজার গুণগান দুকলম লিখে, কখনো কবিতা রচনা করে, কখনো রাজ-গুণকীর্তন গেয়ে রাজসভায় স্থান করে নেওয়ার শামিল। ছোটবেলায় যাত্রা (গীতাভিনয়বিশেষ) শুনতে যাত্রা-প্যান্ডেলে যেতাম। শুরুতেই তারা 'পূবেতে বন্দনা করি পূবের ভানুশ্বর, একদিকে উদয় রে ভানু চৌদিকে পশর...' ইত্যাদি গৌরচন্দ্রিকা দিত। বর্তমান যুগে আমদের সমাজে নব নব রূপে 'গৌরচন্দ্রিকা' উদ্ভাসিত হয়েছে।

কর্ম ও রুটি-রুজির তাগিদে এবং বিশেষায়িত জ্ঞানের আবির্ভাবে বর্তমান সমাজ বিভিন্ন পেশাদারিত্বের সমাজ। প্রতিটা পদে আমরা বিভিন্ন পেশাদারের স্মরণাপন্ন হচ্ছি। পেশাদার ছাড়া জীবন চলে না, কাজও ভালো হয় না। এক সময় দেখতাম, ডাক্তার হাতুড়ে, না-কি এমবিবিএস? এখন দেখি কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। এদেশে এরকম একটা প্রবাদও আছে, 'যার কাজ তার সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে'। আমরা বাস্তবে এ প্রবাদের উল্টোটা করি। যেমন–আমরা শিক্ষকতা ও শিক্ষার নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে অনেকটাই উল্টো কাজে যোগ দিয়েছি। নিজের দলের বা মতের দলবাজ লোকজন, যাদের গায়ে অন্তত শিক্ষকতার গন্ধ আছে, দলবাজী করাই যাদের মূল লক্ষ্য, তাদেরকে বেছে নিই। তারা যতটা না শিক্ষক, তারচেয়ে অনেক বেশি রাজনীতিক, রাজনৈতিক আনুগত্য, ভিনদেশী ভোগবাদী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তারা দলের কাঁধে ভর করে লুকিয়ে রাখা ব্যক্তিগত ইজম বাস্তবায়ন করতে চান। তাদেরকে দিয়ে আমরা শিক্ষার নীতি নির্ধারণসহ শিক্ষাসংক্রান্ত সবকিছু করাতে চেষ্টা করি। তারা মনে মনে নিজের উন্নতির একটা লক্ষ্য ঠিক করে নেন, তারপর কখনো একা একা, কখনো কোরাস ধরে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে মোসাহেবি ও গুণকীর্তনে রত হন। নিজেদের পেশা ও পেশাগত কর্ম অবহেলিত হয়ে পিছনে পড়ে থাকে। শ্যামও রাখি, কূলও রাখি। শেষে কাজের কাজ কিছুই হয় না, বা 'ঘ্রানং অর্ধনং ভোজনং' সার হয়। এটা এদেশের চলতি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটা পেশাতে এগুলো করে আমারা যেমন পেশাদারিত্বের অবমাননা করছি, তেমনিভাবে দলবাজিও করছি। রাজনৈতিক দলগুলোও এভাবে বাড়তি কিছু কিছু সুবিধা দিয়ে দলে লোক ভেড়াচ্ছে। মূল কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ব্যক্তিপর্যায়ে লাভবান হচ্ছি।

উন্নতি করার আগে বটলনেক জায়গাগুলো ও ক্ষতিকর উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে হবে, এগুলোকে আমরা লিমিটিং ফ্যাক্টরও বলে থাকি। লিমিটিং ফ্যাক্টর মুক্ত করাও এক ধরনের চিকিৎসা। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষেই উন্নতি করতে হলে দলমত নির্বিশেষে মেরুদণ্ডসম্পন্ন জাত শিক্ষাবিদদের হাতে শিক্ষা-পলিসি তৈরি, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার কাজ দিতে হবে। তাদেরকে রাজনৈতিক বিভেদমুক্ত রাখতে হবে। তারা এদেশ, দেশের স্বাধীনতা, ইতিহাস, দেশীয় সংস্কৃতি, সামাজিক বুনন, দেশীয় মূল্যবোধ, ভবিষ্যত ইত্যাদি দুচোখ মেলে দেখবেন। আমরা জানি, রাজনৈতিক দল ও কোনো মামলার উকিলসহ কিছু কিছু পেশা আছে যারা একচোখা। তারা একটা চোখ ব্যবহার করেই টিকে আছেন। বিচারক ও শিক্ষকতা পেশাসহ আরো কিছু পেশা আছে যাদের দুটো চোখ থাকতে হয় এবং দুটো চোখই সমানভাবে ব্যবহার করতে হয়। নইলে সমাজ অচল হয়ে যায়। এর ব্যত্যয় হচ্ছে বলেই-না সমাজে এত অসুবিধা। কোনো বিষয়ে এই একচোখা সিদ্ধান্তই এদেশের সাধারণ নাগরিকের ক্ষতি করছে বেশি। দল থাকা প্রয়োজন, কিন্তু দলবাজিই এদেশের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়া বাস্তবতা হলো: এদেশের ঐতিহাসিক কারণে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পুরোটাই সেই-যে রাজনীতিবিদের হাতে চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে পরবর্তীতে সমাজের সুশিক্ষিত লোকের হাতে আর ফিরে আসেনি। রাজনীতিতে সুশিক্ষিত লোক কমছে। বরং রাজনীতিই দুরাচারদের কবলে ক্রমশই চলে যাচ্ছে। সমাজসেবা, দেশসেবায় ক্রমশই দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে ও এখনো হচ্ছে। অনৈতিক চরিত্রের অধিকারী, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারকারীরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছলে, বলে, কৌশলে বিভিন্ন পেশার সুচতুর লোকজন প্রকাশ্যে বা ছদ্মবেশে রাজনীতির কর্মে যোগ দিয়েছে। প্রতিটা পেশারই রাজনীতিকীকরণ হয়েছে। এ ধরণের সুচতুর লোকজন রাজনীতিকে কলুষিত করছে, সমাজেরও ক্ষতির কারণ হচ্ছে। পেশাজীবীদের অনেকে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা ও আইনের উর্ধ্বে চলাফেরার মানসিকতার ফলে দেশে আইনের শাসন বিঘ্নিত হচ্ছে। ব্যবসায়ীরাও অল্প কাজে অধিক লাভের আশায় রাজনীতির ছত্রছায়ায় জড়ো হচ্ছে এবং আইনের দীর্ঘসূত্রিতার ঘেরাটোপে ফেলে আইনের উর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে। রাজনীতিবিদরা তাদের কাজ করুক, আমরা বিভিন্ন পেশাজীবীরা আমাদের কাজে রত হই– এমনটা হওয়াই

নিয়মের কথা। 'গোলে হরিবোল দিয়ে কাছিম জড়ো করা' কোনোমতেই সমীচীন নয়। এতে ফলাফল শূন্যের রেখা পেরিয়ে নেগেটিভ-মুখী হয়ে যায়। এভাবে সমাজের মনুষ্যত্ববোধ বিবর্জিত সুচতুর-ফন্দিবাজরাই অন্যায়ভাবে লাভবান হচ্ছে। এখান থেকে কি সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ ও দেশ-উন্নয়নের নিয়ামক আশা করা যায়? কালবোশেখি নিকষকালো মেঘের কাছে কি শ্রাবনের স্নিগ্ধ-মেদুর অবিরাম বর্ষণ পাওয়া যায়? অথচ এতেই আমরা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। আমাদের আচরণ অনেকটাই কীর্তিনাশা পদ্মার মতো। বর্ষায় বন্যা ও স্রোতের প্রবল তাণ্ডবে দুকূলের যত সুকীর্তি আছে ভাসিয়ে নিয়ে চলি। আবার শীত-মৌসুমে ধূ-ধূ বালির বিরাণ প্রান্তরে বসে অতীত কীর্তির কথা মুখে আওড়িয়ে বিলাপ-ধ্বনিতে মুখরিতে করে তুলি। আগল ভেঙে বেরিয়ে আসার কোনো চেষ্টাই আমরা করছিনে। নিজেদের ভুলত্রুটিগুলো আমরা শুধরে নিইনে। এভাবেই দিন সামনে এগোচ্ছে। বিভিন্ন পেশায় পেশাদারিত্বের প্রাধান্য ক্ষীণ হয়ে আসছে, পরিবর্তে দলীয় আনুগত্য প্রাধান্য পাচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকতা পেশার মতো অন্যান্য সকল পেশার ক্ষেত্রেই একই ধারা চলছে। বিষয়টা বিবেচনীয়। অথচ আধুনিক শিক্ষা ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে কোনো দেশে কোনো সুনির্দিষ্ট ইজম প্রতিষ্ঠা করার দিন শেষ।

বিশ্বের যে দেশেই 'রাজ' ও 'রাজা' শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়ম-নীতি, বাধা-নিষেধ না মানার রেওয়াজ তৈরি হয়ে গেছে। এতে রাজনীতি নীতিচ্যুত হচ্ছে, দেশ গড়া ও দেশের প্রশাসন বিঘ্নিত হচ্ছে। এ দুটো শব্দ সকল জবাবদিহি ও দায়দায়িত্বের ঊর্ধ্বে চলে গেছে। এজন্য রাজনীতিতে এত লোকসমাগম হচ্ছে। এখানে যে কোনো অপকর্ম করেই পার পাওয়া যায়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো যেমন- ভারত, মিয়ানমার, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির দিকে তাকালে রাজনীতির ও মানবিক নিয়ম-নীতি না মানার অস্তিত্ব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে। পশ্চিমা অনেক দেশের অবস্থাও ভালো না। আমরা সিরিয়ার সাথে তুরস্কের তুলনা করতে পারি। অথচ প্রত্যেকেই আমরা মানুষ। মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানুষ– এটাই আমাদের প্রধান পরিচয়। উন্নতির তুলনায় হিংসা-বিদ্বেষ, দলাদলি, লাঠালাঠি, পরনিন্দা, তখত নিয়ে ব্যবসা বেশি হচ্ছে। 'খাজনার তুলনায় বাজনা বেশি' হচ্ছে। সময় এসেছে আইন করে রাজনীতিরও একটা নীতি প্রতিষ্ঠা করা। সময় এসেছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সুশিক্ষিত পেশাজীবীদের নির্দলীয় পেশাদারিত্ব-ব্যবস্থার সম্মিলনে সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধারার ভারসাম্যপূর্ণ একটা কাঠামো তৈরি করা। রাজনীতিবিদদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মের জবাবদিহির ব্যবস্থা করা; তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডের নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করা। এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মানুষ পৃথিবীতে বসে মহাকাশে কি হচ্ছে তা টেকনোলজির সাহায্যে দেখছে। একটা দেশের কারো কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করার ব্যবস্থা সে-দেশের মানুষই পারে। দরকার কাজ করার ইচ্ছা। তখন প্রতিটা দেশই তার গতিপথ ফিরে পাবে। রাষ্ট্রে বসবাস হবে সাবলীল ও স্বস্তিদায়ক। প্রতিটা দেশই হবে এক-একটি সার্বভৌম উন্নয়নকেন্দ্র। আমাদের এখনো পথ বহুদূর যেতে হবে। ধূ-ধূ মাঠ, বালিয়াড়ি, প্রখর সূর্য পেরিয়ে তারপর বনাঞ্চল, সবুজের ছায়া।

(৩ জুন ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।